بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান খলীফা ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২৬শে ফেব্রুয়ারি, ২০২১ ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় হযরত উসমান (রা.)'র স্মৃতিচারণের ধারা অব্যাহত রাখেন।

তাশাহহুদ, তাআ'ব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, হযরত উসমান (রা.)'র খিলাফতকালে সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধাভিযান ও বিজয় সম্পর্কে আলোচনা চলছিল, আজও সেগুলোই বর্ণনা করব। এরপর হুযূর হযরত উসমান (রা.)'র যুগে সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধাভিযানের বর্ণনা দেন। ৩০ হিজরীতে সাঈদ বিন আস (রা.) তাবারিস্তান জয় করেন। ৩১ হিজরীতে সাওয়ারি বিজিত হয়; আল্লামা ইবনে খালদুনের মতে এই যুদ্ধ আলেকজান্দ্রিয়ায় সংঘটিত হয়েছিল। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন আবি সারাহ্ যখন ফরাসীদের আফ্রিকিয়া ও স্পেনে পরাজিত করেন, তখন রোমানরা খুব উত্তেজিত হয় এবং হিরাক্লিয়াসের পুত্র কনস্টানটিন-এর নেতৃত্বে জড়ো হয়; তার নেতৃত্বাধীন বিশাল রোমান বাহিনীর সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ হয়। রোমান বাহিনীতে ৫০০ জাহাজের বিশাল নৌবহর ছিল। আমীর মুয়াবিয়া (রা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সা'দকে মুসলিম নৌবাহিনীর দায়িত্ব দেন; প্রচণ্ড যুদ্ধের পর অবশেষে আল্লাহ্র কৃপায় মুসলমানগণ জয়ী হন, কনস্টানটিন অবশিষ্ট বাহিনীসহ পলায়ন করে। হাবীব বিন মাসলামার নেতৃত্বে ৩১ হিজরীতে মুসলমানরা আর্মেনিয়া জয় করেন, একই বছর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমেরের নেতৃত্বে খোরাসান বিজিত হয়। তুর্কমেনিস্তানের মার্ভ-এর বাসিন্দারাও সে বছরই মুসলমানদের সাথে সন্ধিচুক্তি করে নেয়। ৩২ হিজরীতে আমীর মুয়াবিয়া (রা.) রোমে অভিযান চালান, এমনকি কনস্টানটিনোপোলের দরজা পর্যন্ত তিনি পৌঁছে যান। ৩২ হিজরীতে মারবরুস, ফারিয়াব, তালকান, জুযাজান, তাখারিস্তান প্রভৃতি অঞ্চলগুলোও আহনাফ বিন কায়েসের নেতৃত্বে বিজিত হয়, এগুলো সব বর্তমান আফগানিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল। বাল্খ বর্তমান আফগানিস্তানের সবচেয়ে প্রাচীন শহর, এটিও ৩২ হিজরীতে আহনাফ বিন কায়েস অবরোধ করেন, অবশেষে তারা বশ্যতা স্বীকার করে ও সন্ধিচুক্তি করে নেয়। ৩২ হিজরীতেই হারাতের অভিযানও সংঘটিত হয়; হযরত উসমান (রা.) খুলায়েদ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন হানফীকে সেখানে প্রেরণ করেছিলেন। খুলায়েদ প্রথমে হারাত জয় করেন, কিন্তু তারপর সম্রাট কারিনের সাথে হাত মিলিয়ে বিদ্রোহ করে বসে। পরবর্তীতে মুসলমানরা কারিনকে পরাজিত ও হত্যা করেন এবং হারাত পুনরুদ্ধার হয়। হযরত উসমান (রা.)'র খিলাফতকালেই ভারতবর্ষে ইসলামের বাণীও পৌঁছে যায়। হযরত মুজাশা' বিন মাসঊদ সুলাম্মী কাবুলে মুসলিম বাহিনীর জিহাদের নেতৃত্বে ছিলেন এবং তিনিই কাবুল জয় করেন; সেই যুগে কাবুল ভারতবর্ষের অংশ বলে গণ্য হতো। হযরত উসমান (রা.)'র খিলাফতকালেই হযরত মুজাশা' বেলুচিস্তানে ইসলাম-বিরোধীদের সাথে লড়াই করেন ও সাজস্তান জয় করেন।

হযরত উসমান (রা.)'র খিলাফতকালে সম্ভাব্য বিশৃঙ্খলার ব্যাপারে স্বয়ং মহানবী (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্ শরীফে হযরত আয়েশা (রা.)'র বরাতে এ সংক্রান্ত হাদীসে মহানবী (সা.) বলেছেন, **'হে উসমান! হতে পারে, আল্লাহ্ তোমাকে একটি কামিজ বা পোশাক পরিধান করাবেন, কিন্তু মানুষ যদি তোমার কাছে এই পোশাক খুলে ফেলার দাবী জানায় তাহলে তুমি তাদের কথায় কখনোই এই পোশাক খুলবে না।'** মহানবী (সা.) বারবার দৃঢ়তার সাথে তাকে তা খুলতে নিষেধ করেন। কায়েসকে হযরত উসমানের মুক্ত ক্রীতদাস আবু সাহলা বলেছিলেন, ইয়াওমুদ্দার-এর দিন, যেদিন

বিদ্রোহীরা হযরত উসমান (রা.)-কে তাঁর বাড়িতে অন্তরীণ করে এবং তাঁকে করুণভাবে শহীদ করে, সেদিন সকালে হযরত উসমান (রা.) বলেছিলেন, **'মহানবী (সা.) আমাকে একটি তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছিলেন, আর আমি সেদিকেই এগিয়ে চলছি। আর আমি ধৈর্যের সাথে এর ওপর অবিচল থাকব।'** এ বিষয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) অত্যন্ত বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন, যার অংশবিশেষ হুযূর (আই.) খুতবায় উদ্ধৃত করেন। বিশৃঙ্খল সেই পরিস্থিতি নিয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে; এমনকি এই নৈরাজ্যের হোতা হিসেবে হযরত উসমান (রা.) ও হযরত আলী (রা.)'র প্রতিও সন্দেহের তীর ছোঁড়া হয়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) অত্যন্ত জোরালোভাবে এই ভ্রান্তির অপনোদন করে বলেন, হযরত উসমান (রা.) ও আলী (রা.) উভয়ই একদম প্রথম দিকের উৎসর্গিত মুসলমান ছিলেন, তাঁদের সাথীরাও ইসলামের শ্রেষ্ঠ সন্তান ছিলেন, তাঁদের বিশ্বস্ততা ও তাক্বওয়া সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। এই দু'জন ও তাঁদের সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে যেসব অপলাপ করা হয়, তা ইসলামের শত্রুদের কাজ। প্রশ্ন উঠে, তাহলে এই বিশৃঙ্খলার উৎপত্তি কীভাবে হল? কেউ বলে, হযরত উসমান (রা.) নাকি (নাউযুবিল্লাহ্) কিছু বিদআত আরম্ভ করেছিলেন, যার ফলে মুসলমানরা তাঁর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। অপর কতক বলেন, হযরত আলী (রা.) নাকি গোপনে খিলাফত লাভের জন্য ষড়যন্ত্র শুরু করেছিলেন। অথচ এই দু'টো কথাই সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত; তাঁরা উভয়েই এসবের অনেক ঊর্ধ্বে, অত্যন্ত পবিত্র ব্যক্তি ছিলেন। হযরত উসমান (রা.) তো সেই ব্যক্তি, যাঁর সম্বন্ধে স্বয়ং মহানবী (সা.) বলেছিলেন– **উসমান যা-ই করুক না কেন, সেটির জন্য তাকে কোন জবাবদিহি করতে হবে না**। মহানবী (সা.)-এর এ কথার অর্থ মোটেও এটি ছিল না যে, উসমান (রা.) কোন অন্যায় কাজ করলেও আল্লাহ্ তাঁকে ছেড়ে দিবেন; বরং এর অর্থ ছিল– তিনি পুণ্যে এতটাই উন্নতি সাধন করেছেন যে, তাঁর পক্ষে আল্লাহ্র আদেশ-বিরুদ্ধ কোন কাজ করা সম্ভবই না। আর হযরত আলী (রা.)'র পক্ষে ঘুণাক্ষরেও এটি সম্ভব ছিল না যে, তিনি খিলাফতে সমাসীন হওয়ার জন্য কোন ষড়যন্ত্র করবেন। হযরত উসমান (রা.)'র খিলাফতের প্রথম ছয় বছর বিশৃঙ্খলার কোন নাম-গন্ধও দেখা যায় নি; বরং ইতিহাস থেকে জানা যায়, সেই যুগটিতে হযরত উসমান (রা.), হযরত উমর (রা.)'র চেয়েও বেশি জনপ্রিয় ছিলেন। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে তাঁর খিলাফতের সপ্তম বছরে আমরা একটি আন্দোলন মাথাচাড়া দিতে দেখতে পাই, কিন্তু সেটি হযরত উসমান (রা.)'র বিরুদ্ধে ছিল না, বরং হয় তা সাহাবীদের বিরুদ্ধে ছিল, অথবা হযরত উসমান (রা.) কর্তৃক নিযুক্ত কোন কোন গভর্নরের বিরুদ্ধে ছিল। আর সেই আন্দোলনের হোতা ছিল নবাগত কিছু মুসলমান, যারা প্রথম যুগের মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব, মর্যাদা ও সম্মান এবং প্রতিপত্তির কারণে ঈর্ষান্বিত ছিল এবং নিজেরা তাদের সেই অবস্থানের আকাঙ্ক্ষী ছিল। কিন্তু তাদের এই ভয়ও ছিল যে, সাধারণ মুসলমানরা তাদের এই মনোভাব জানতে পারলে তাদের আর রক্ষা নেই; তাই তারা গোপনে সাহাবীদের বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। এভাবে ধীরে ধীরে তারা দলভারি করতে থাকে। এই নবাগত মুসলমানরা মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সান্নিধ্যও লাভ করে নি, আর মহানবী (সা.)-এর সান্নিধ্য লাভকারী সাহাবীদের সান্নিধ্যে থাকারও তাদের আগ্রহ ছিল না, ফলে তাদের মধ্যে সেই আধ্যাত্মিক ও পবিত্র পরিবর্তন সাধিত হয় নি, যা হওয়া দরকার ছিল। তা সত্ত্বেও তারা নিজেদেরকে খুব পবিত্র ও পুণ্যবান জ্ঞান করতো। তাদের কোন অপকর্মের জন্য তারা শাস্তিপ্রাপ্ত হলে সংশোধনের পরিবর্তে তাদের মধ্যে ক্ষোভ ও ঘৃণার আবহ সৃষ্টি হতে থাকে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এরূপ একটি ঘটনার উল্লেখও করেন, তখন মদীনায় এমন জঘন্য মূর্খও ছিল, যে কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশের বিরোধী কোন কাজ করে, যার শাস্তিস্বরূপ হযরত উসমান (রা.)

তাকে মদীনা থেকে বিতাড়িত করেন। এসব ষড়যন্ত্রের মূলে আসলে ছিল ইহুদীরা, যাদের সাথী হয়েছিল কিছু জগৎলোভী মুসলমান। হযরত উসমান (রা.)'র পক্ষ থেকে নিযুক্ত আমীরদের প্রকৃতপক্ষে কোন দোষ ছিল না; তাদের দোষ শুধু এটাই ছিল যে, হযরত উসমান (রা.) তাদের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন! আর হযরত উসমান (রা.)'র দোষ ছিল– কেন তিনি বার্ধক্য সত্ত্বেও ইসলামকে ঐক্যবদ্ধ করে নিজের করতলে সুরক্ষিত রাখছিলেন, কেন অত্যাচারী-অনাচারীদেরকে তাদের মনমতো দুর্বলদের ওপর অত্যাচার করার সুযোগ দিচ্ছিলেন না! এমনকি কূফাতেই অনুষ্ঠিত বিশৃঙ্খলাপরায়ণদের একটি সভায় তারা এই আলোচনা করে যে, **'যতক্ষণ উসমান জীবিত আছেন, ততক্ষণ আমরা কেউ-ই মাথা তুলতে পারব না।'**

হযরত উসমান (রা.) সেই বিশৃঙ্খলাপরায়ণদেরও ডাকেন এবং সাহাবীদেরও ডাকেন; তিনি ষড়যন্ত্রের ভেতরের সব কথা তাদের সামনে প্রকাশ করেন এবং যে দু'জন সংবাদদাতা তাকে ভেতরের খবর জানিয়েছিলেন, তারাও সাক্ষ্য দেন। সবাই একযোগে ফতওয়া দেন– এই বিশৃঙ্খলাপরায়ণরা হত্যাযোগ্য, এদেরকে হত্যা করুন, কারণ মহানবী (সা.) এরূপ পরিস্থিতিতে এরূপ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের জন্য এই নির্দেশই দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু হযরত উসমান (রা.) বলেন– না, আমরা তাদেরকে ক্ষমা করব এবং তাদের অজুহাত মেনে নিব; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা শরীয়ত অনুসারে কোন শাস্তিযোগ্য অপরাধ না করছে, তাদেরকে শাস্তি দেব না, বরং তাদেরকে বোঝানোর পূর্ণ চেষ্টা করব। হযরত উসমান (রা.) একইসাথে বিশৃঙ্খলাপরায়ণদের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি আরোপিত আপত্তিগুলোও একে একে তুলে ধরেন, সেগুলোর বিস্তারিত বলেন এবং সেগুলোর অপনোদন করেন। সাহাবীরা বারংবার জোর দিচ্ছিলেন, তাদেরকে হত্যা করা হোক; কিন্তু হযরত উসমান (রা.) তাদের সুযোগ দিতে চাইছিলেন। সে সময় তিনি তাদেরকে না বাঁচালে মুসলমানরা তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলতেন। হযরত উসমান (রা.) চাইছিলেন– যে করেই হোক, এরা যেন হিদায়েত লাভ করে! তাদের স্পষ্ট বিদ্রোহকে তিনি 'বিদ্রোহের চেষ্টা' গণ্য করে তাদেরকে ছাড় দিতে চান। এই ঘটনা এ-ও প্রমাণ করে যে, মদীনাবাসী বা সাহাবীরা এদের সাথে ছিলেন না; যদি থাকতেন, তবে অন্য কোন সুযোগের অপেক্ষায় না থেকে সেদিনই হযরত উসমান (রা.)-কে হত্যা করে ফেলা হতো। মাত্র তিনজন মদীনার বাসিন্দা তাদের সমমনা ছিল। এই নির্বোধরা হযরত উসমান (রা.)'র এই বদান্যতা ও কৃপার কারণে কৃতজ্ঞ ও অনুতপ্ত হওয়ার পরিবর্তে উল্টো আরও বেশি বিদ্বেষ ও ঘৃণার আগুনে জ্বলতে লাগে; হযরত উসমান (রা.)'র দেয়া সুস্পষ্ট উত্তরকে নিজেদের জন্য চরম অপমান জ্ঞান করতে থাকে। হযরত উসমান (রা.)'র ক্ষমাকে নিজেদের প্রাণ রক্ষা পাবার কারণ না ভেবে তারা নিজেদের চাতুর্য ও ধূর্ততাকে প্রাণ রক্ষার কারণ ভাবছিল। এবার বেঁচে গিয়ে তওবা করার পরিবর্তে তারা পরেরবার কীভাবে নিজেদের ষড়যন্ত্র সফল করবে– সেটি ভাবতে ভাবতে ফিরে যায়। হুযূর (আই.) বলেন, আগামীতে এই ঘটনার অবশিষ্ট বর্ণনা করা হবে (ইনশাআল্লাহ্)।

এরপর হুযূর (আই.) সম্প্রতি প্রয়াত ৪জন নিষ্ঠাবান আহমদীর স্মৃতিচারণ করেন। তাদের মধ্যে প্রথম হলেন, শহীদ আব্দুল কাদের সাহেব, যাকে গত ১১ই ফেব্রুয়ারি, ২০২১ দুপুরে পেশোয়ারে তার চাচার ক্লিনিকে গুলি করে শহীদ করা হয়, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। দ্বিতীয় জানাযা মোকাররম আকবর আলী সাহেবের, যিনি গত প্রায় সাড়ে চার মাস ধরে আসীরে রাহে মওলা বা আল্লাহ্‌র রাস্তায় কারাবন্দী ছিলেন; ১৬ই ফেব্রুয়ারি শেখুপুরা কারাগারে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তৃতীয় জানাযা মোকাররম খালেদ মাহমুদুল হাসান ভাট্টি সাহেবের, যিনি তাহরীকে জাদীদের উকিলুল মাল সালেস ছিলেন; তাহের হার্ট ইন্সটিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মাত্র ৬৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। চতুর্থ জানাযা সদর

আঞ্জুমান আহমদীয়া রাবওয়ার আইন-উপদেষ্টা মোকাররম মোবারক আহমদ তাহের সাহেবের, যিনি গত ১৭ই ফেব্রুয়ারি তাহের হার্ট ইন্সটিটিউটে ৮১ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। হুযূর (আই.) প্রয়াতদের স্মৃতিচারণে তাদের অসাধারণ সব গুণ ও বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে উল্লেখ করেন আর তাদের বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের ফিরিস্তি দেন। তিনি তাদের রূহের মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করে দোয়া করেন; তাদের পরিবারবর্গের জন্যও দোয়া করেন এবং তাদের বংশধরদের মাধ্যমে তাদের পুণ্যকর্ম অব্যাহত থাকার জন্য দোয়া করেন। (আমীন)

[প্রিয় শ্রোতামণ্ডলি! হুযুরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোন বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]